জানুয়ারী ২০১৯
৮ম পর্ব । ১ম সংখ্যা

ইনফো মেডিকাস

স্বাস্থ্য সাময়িকী

সূচী

রোগের ইতিকথা	২
মানবদেহ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৫
বিশেষ প্রবন্ধ	৬
জীবাণু পরিচিতি	৯
রোগ ও চিকিৎসা	১০
চিকিৎসা পদ্ধতি	১২
স্বাস্থ্যকথা	১৪
ইনফো কুইজ	১৫

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ সাইকা বুশরা

ধনুষ্টংকার

মিশরীয় চিকিৎসাবিদ এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস একজন আহত রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে রোগীর ঘাড়ের মাংসপেশী এবং লিগামেন্ট শক্ত হয়ে গিয়েছে। আর এটিই ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস রোগ সম্পর্কিত প্রথম বিবরণ। পরবর্তীতে চিকিৎসাবিদ হিপোক্রেটস একজন নাবিকের এই ধরণের একটি রোগ সনাক্ত করেন যার প্রধান উপসর্গ ছিল ঐচ্ছিক মাংসপেশীর অতিসঙ্কোচন। তিনি গ্রীক শব্দ 'টেনশন' থেকে এই রোগের নামকরণ করেন 'টিটেনাস'। ১৮৮৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী আর্থার নিকোলেয়ার প্রথম ধনুষ্টংকার রোগের জীবাণু *Clostridium tetani* আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী আর্থার এর এই আবিষ্কারকে পরবর্তীতে জাপানিজ অণুজীববিদ শিবাসাবুরো কিতাসাতো আরো গবেষণা করেন এবং ১৮৯০ সালে টিটেনাস অ্যান্টিটক্সিন আবিষ্কার করেন যা সফলতার সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীতে ধনুষ্টংকার প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়।

আর্থার নিকোলেয়ার
(১৮৬২ - ১৯৪২)

শিবাসাবুরো কিতাসাতো
(১৮৫৩ - ১৯৩১)

রক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্ত সংবহনতন্ত্র শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্র যার মাধ্যমে হৃদপিন্ড থেকে দেহের সব জায়গায় রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং দেহের সব জায়গা থেকে উৎপন্ন বর্জ্য (যেমনঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া) হৃদপিন্ডে নিয়ে আসে। হৃদপিন্ডের ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এই সংবহন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। প্রতি মিনিটে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের হৃদপিন্ডে ৭০-৭৫ বার স্পন্দন হয়।

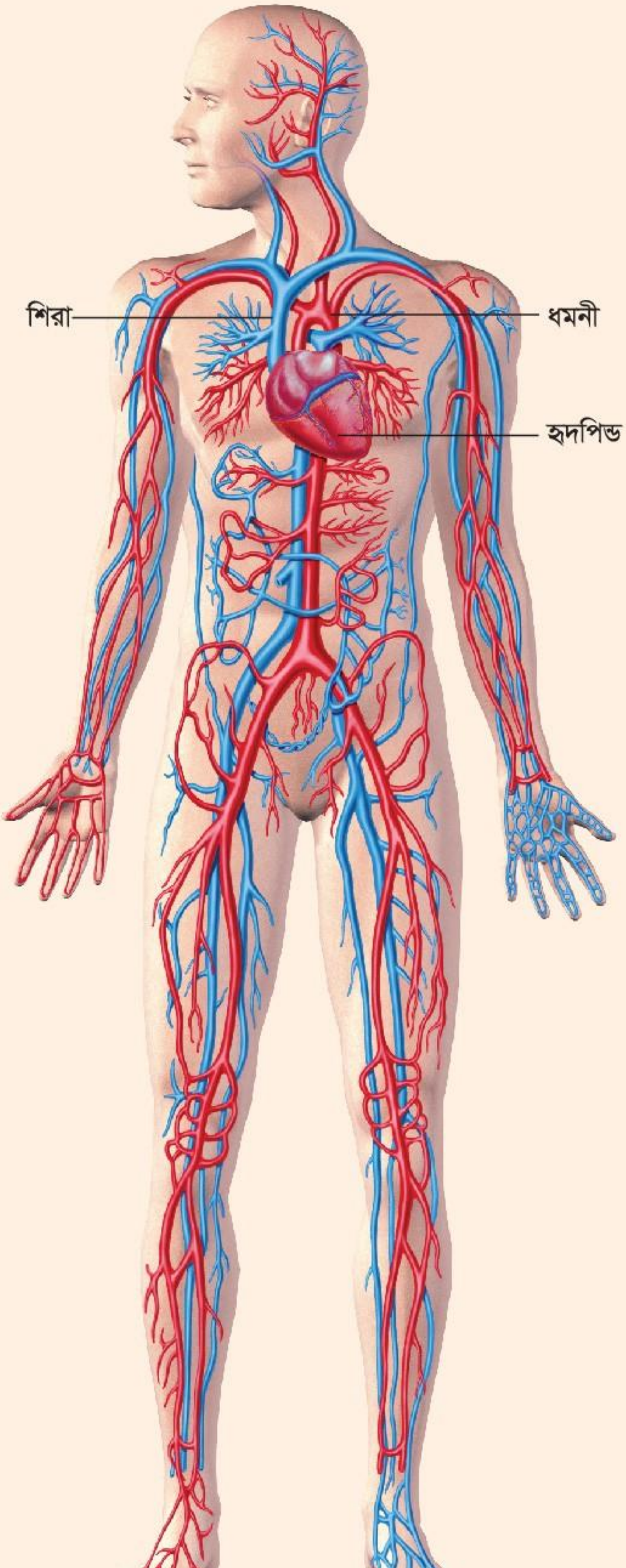

উপাদান

রক্ত সংবহন তন্ত্রের উপাদানগুলো হলো-

- হৃদপিন্ড (Heart)
- রক্তনালী (Blood Vessels)
- রক্ত (Blood)

হৃদপিন্ড (Heart)

হৃদপিন্ড বক্ষ গহ্বরের মধ্যচ্ছেদার উপরে এবং বুকের মাঝ থেকে কিছুটা বাম দিকে অবস্থিত। হৃদপিন্ড দেখতে ত্রিকোনা মোচার মত। এটি অনেকটা লালচে খয়েরি রঙের যার দৈর্ঘ্য ১২ সে.মি. ও প্রস্থ ৯ সে.মি.। এর উপরের অংশটি চওড়া এবং নিচের অংশটি সরু। এটি পেরিকার্ডিয়াম নামক দ্বিস্তরী ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। বাইরের স্তরকে বলা হয় প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম এবং ভিতরের স্তরকে বলা হয় ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম। হৃদপিন্ড প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ ও কপাটিকা নিয়ে গঠিত।

প্রাচীর (Wall)

হৃদপিন্ডের প্রাচীর হচ্ছে একটি অনৈচ্ছিক পেশী। হৃদপিন্ডের এই পেশীগুলোকে বলা হয় হৃদপেশী বা কার্ডিয়াক পেশী যা তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।

- এপিকার্ডিয়াম
- মায়োকার্ডিয়াম
- এন্ডোকার্ডিয়াম

প্রকোষ্ঠ (Chamber)

হৃদপিন্ডের ৪ টি প্রকোষ্ঠ আছে, যার মধ্যে দুটি হৃদপিন্ডের সংগ্রাহক প্রকোষ্ঠ (অলিন্দ) এবং দুটি প্রেরক প্রকোষ্ঠ (নিলয়)।

- ডান অলিন্দ (Right Atrium)- ডান অলিন্দে ঊর্ধ্ব মহাশিরা (Superior Venacava) ও নিম্ন মহাশিরা (Inferior Venacava)

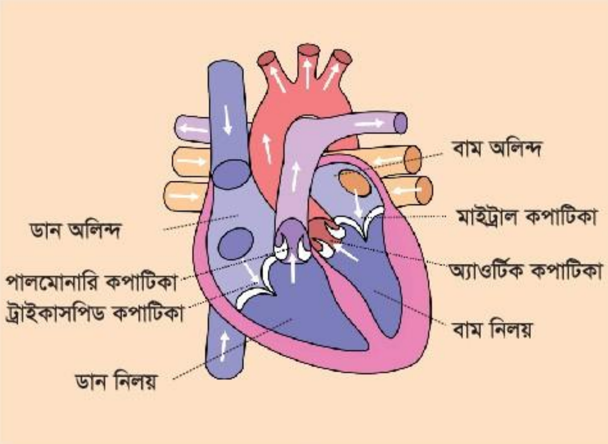

হৃদপিন্ড

যুক্ত থাকে। ইহার মাধ্যমে দূষিত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। ডান অলিন্দের প্রাচীরে অবস্থিত পেস মেকার হৃদপিন্ডের ছন্দ গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে

- বাম অলিন্দ (Left Atrium)- এই অলিন্দে ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary Vein) যুক্ত থাকে যার মাধ্যমে বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে
- ডান নিলয় (Right Ventricle)- ইহার সাথে ফুসফুসীয় ধমনী (Pulmonary Artery) যুক্ত থাকে যার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত দূষিত রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে
- বাম নিলয় (Left Ventricle)- ইহার সাথে যুক্ত থাকে মহা ধমনী (Aorta) যার মাধ্যমে অক্সিজেন পূর্ণ বিশুদ্ধ রক্ত সজীব কোষে পৌঁছায়

কপাটিকা (Valve)

হৃদপিন্ডের ৪ টি কপাটিকা আছে-

- ট্রাইকাসপিড কপাটিকা- ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ডান অলিন্দ থেকে রক্তকে ডান নিলয়ে প্রেরন করা কিন্তু রক্তকে বিপরীত পথে যেতে বাধা দেওয়া হলো এর কাজ
- বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকা- বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বাম অলিন্দ থেকে রক্তকে বাম নিলয়ে প্রেরন করা কিন্তু রক্তকে বিপরীত পথে যেতে বাধা দেওয়া হলো এর কাজ
- পালমোনারি কপাটিকা- ডান নিলয় ও ফুসফুসীয় ধমনীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। রক্তকে ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনীতে প্রেরন করা, কিন্তু রক্তকে বিপরীত পথে যেতে বাধা দেওয়া হলো এর কাজ
- অ্যাওর্টিক কপাটিকা- বাম নিলয় ও মহা ধমনীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। রক্তকে বাম নিলয় থেকে মহা ধমনীতে প্রেরন করা, কিন্তু রক্তকে বিপরীত পথে যেতে বাধা দেওয়া হলো এর কাজ

রক্তনালী (Blood Vessels)

রক্ত হৃদপিন্ড থেকে ধমনীর মাধ্যমে শরীরের প্রত্যেকটি স্থানে পৌঁছে এবং শিরার মাধ্যমে শরীরের সব স্থান থেকে হৃদপিন্ডে ফেরত আসে। আমাদের হৃদপিন্ড পাম্প করার সময় বেশ কিছু রক্ত ফুসফুসে যায়। একইসঙ্গে আমরা যখন শ্বাস নেই তখন বাতাস থেকে অক্সিজেন আমাদের ফুসফুসে ঢোকে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

প্রকারভেদ

- ধমনী (Artery)
- শিরা (Vein)
- কৈশিক জালিকা (Capillary)

রক্ত (Blood)

রক্ত বিশেষ ধরণের তরল যোজক কলা। আমাদের শরীরে সাড়ে চার থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে। রক্ত অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহন ও দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে থাকে ।

রক্তের উপাদান

১) কোষীয় উপাদান (৪৫%)- রক্তে প্রধানত তিন ধরণের কণিকা রয়েছে-

- লোহিত রক্তকণিকা - রক্তের কণিকাগুলোর মধ্যে লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক উপাদান থাকায় রক্তের রং লাল হয়। লোহিত রক্তকণিকা আমাদের দেহের সর্বত্র অক্সিজেন পৌঁছে দেয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুসফুসের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয়
- শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Cell)- শ্বেত রক্তকণিকা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ করে
- অনুচক্রিকা (Platelet)- অনুচক্রিকা ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে ও রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে

২) তরল আন্তঃকোষীয় পদার্থ (৫৫%) বা প্লাজমা-

- তরল (৯১-৯২%)
- কঠিন (৮-৯%)

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

নিউরোফাইব্রোমেটোসিস

নিউরোফাইব্রোমেটোসিস একটি জিনগত ব্যাধি যা স্নায়ু টিস্যুতে টিউমার গঠন করে। বাবা-মা কারও এই সমস্যা থাকলে সন্তানদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই টিউমারগুলি স্নায়ুতন্ত্রে যেকোনো জায়গায় বিকাশ করতে পারে, যেমন- মস্তিষ্ক, মেরুদন্ড এবং স্নায়ুটিস্যুতে। নিউরোফাইব্রোমেটোসিস সাধারণত শৈশবকাল অথবা প্রারম্ভিক প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেশী দেখা যায়।

কনজাংটিভাইটিস

কনজাংটিভা হলো চোখের স্বচ্ছ আবরণ যা চোখের পাতার ভেতরের এবং স্ক্লেরার সামনের দিককে আবৃত করে রাখে। আর এই কনজাংটিভাতে প্রদাহ হলে তাকে কনজাংটিভাইটিস বলে। কনজাংটিভাইটিস হলে চোখ লাল হয়ে যায়, চোখ প্রচন্ড চুলকাতে পারে, চোখ দিয়ে পানি পরে ও চোখ দিয়ে ময়লা আসতে পারে। এটি সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও অ্যালার্জির কারণে হয়ে থাকে। এটি দুই চোখকেই আক্রান্ত করতে পারে।

একজিমা

একজিমা (Eczema) এমন একটি চর্মরোগ যা হলে ত্বক লাল বর্ণ ধারণ করে, চুলকায় আবার ফুসকুড়িও হতে পারে। ত্বকের যেকোনো অংশেই একজিমা হতে পারে। তবে হাত, পা, বাহু, হাঁটুর বিপরীতে, গোড়ালী, হাতের কব্জি, ঘাড় কিংবা ঊর্ধ বক্ষস্থল ইত্যাদি অংশে বেশি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজিমার প্রধান উৎস বংশগত বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে এটিকে এ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস (Atopic Dermatitis) বলা হয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

রোগের ইতিহাস নেয়া, শারীরিক পরীক্ষা করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

রোগের ইতিহাস নেয়া

যে কোন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান অংশ হলো সঠিকভাবে রোগীর কাছ থেকে রোগের ইতিহাস নেয়া। সহজ, সাবলীল ও আন্তরিকভাবে কথোপকথনের মাধ্যমে আস্থা অর্জন করে রোগীর তথ্য ও রোগের ইতিহাস নেয়া যায়।

রোগীর তথ্য (Particulars of the patient)

- নামঃ ....
- বয়সঃ ....
- লিঙ্গঃ ....
- ধর্মঃ ....
- পেশাঃ ....
- বৈবাহিক অবস্থাঃ ....
- ঠিকানাঃ ....

উপরোক্ত তথ্যগুলো জানা হলে একদিকে যেমন রোগীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সূচনা হয়, অন্য দিকে তা বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করে। কিছু রোগ শুধু বয়স্কদের হয়, যেমন- হাঁপানি (Asthma) রোগ সাধারণত ৪০ বছর বয়সের নিচে হয় না। আবার এলাকাভেদে কিছু রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়, যেমন- পাহাড়ি এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ খুব বেশি হয় ।

প্রধান সমস্যাসমূহ (Chief complaints)

যে সকল সমস্যার কারণে রোগী চিকিৎসকের কাছে এসেছেন, সময় ও গুরুত্ব অনুযায়ী সেই সমস্যাগুলোর তালিকা তৈরি করতে হবে। যেমন- জ্বর ৩ দিন যাবত, পেটে ব্যথা ২ দিন যাবত ইত্যাদি।

বর্তমান অসুস্থতার ইতিহাস (History of present illness)

এই অংশে প্রধান অসুবিধাসমূহ কিছুটা বিস্তারিত লিখতে হবে।

সমস্যাগুলো কতদিন থেকে শুরু হয়েছে, কখন বাড়ে বা কমে, অবস্থান, ধরণ ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ ব্যথার ক্ষেত্রে-

- ব্যথার অবস্থান- ব্যথা পেটের কোন অংশে অনুভূত হচ্ছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে । যেমন- পেটের নিচের অংশে ডান দিকের (Right Iliac Fossa) এলাকায় ব্যথা বা চাকা অনুভূত হলে চিন্তা করতে হবে- Appendicitis, Crohn's Disease, Inguinal Hernia, ও Ovarian Tumour
- ব্যথার ধরণ- চাপ ধরে থাকে, টনটন করে, জ্বালাপোড়া বা চিনচিনে ব্যথা
- ব্যথার মেয়াদ- ২ থেকে ৫ দিন যাবত ব্যথা
- ব্যথার তীব্রতা- ব্যথা বেশী অথবা কম
- ব্যথার বিস্তৃতি- অন্য কোন স্থানে ছড়িয়ে যায় কি না
- ব্যথার উপশম- কি করলে ব্যথা কমে বা বাড়ে
- সহযোগী বৈশিষ্ট্য- বমি বমি ভাব বা বমি, ঘাম

অতীত অসুস্থতার ইতিহাস (History of past illness)

রোগী যে সকল সমস্যা নিয়ে এসেছেন, তা অতীতে কখনও হয়েছে কি না। যদি হয়ে থাকে, তাহলে কতদিন ভুগেছেন এবং কি চিকিৎসায় তা ভাল হয়েছেন। কোন অপারেশনের ইতিহাস আছে কি না। হাঁপানি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মৃগীরোগ, পেপটিক আলসার, যক্ষা, হৃদপিন্ডের কোন সমস্যা, স্ট্রোক ইত্যাদি রোগের কোন ইতিহাস আছে কি না জানতে হবে। অতীত কিছু রোগ অনেক সময় নতুন উপসর্গ নিয়ে আবির্ভূত হয়। কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান রোগটি কোন অতীত রোগের জটিলতার কারণে হতে পারে। যেমন- রোগী অনেক সময় পায়ের আঙুলে ক্ষত বা ঘা নিয়ে আসে যা মূলত ডায়াবেটিস রোগের জটিলতার কারণে হয়ে থাকে।

চিকিৎসার ইতিহাস (History of treatment)

রোগী বর্তমানে কোন ওষুধ ব্যবহার করছেন কি না, কোন ওষুধের প্রতি এলার্জি আছে কি না। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভনিরোধক ওষুধের ইতিহাস জানতে হবে।

পারিবারিক ইতিহাস (Family history)

পরিবারে কারো উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আছে কি না, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়েছিল কি না। পরিবারে কোন জিনগত অসুখ আছে কি না। যেমন- হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিহাস (Socio-economic history)

রোগীর পেশা, সামাজিক মর্যাদা এবং কোন ধরণের বাড়িতে থাকেন। পেশাগত কারণে কিছু রোগ বেশি হয়ে থাকে। যেমন- স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিতদের ক্ষেত্রে Hepatitis B, কৃষকদের ক্ষেত্রে Brucellosis ইত্যাদি ।

ব্যক্তিগত ইতিহাস (Personal history)

- অভ্যাস- ধূমপান বা মদ্যপান
- খাদ্যাভ্যাস- খাবার সময়মত গ্রহণ করেন কি না এবং কি ধরণের খাবার বেশি খান
- যৌন রোগ- কোন ধরণের যৌন রোগ আছে কি না
- মহিলাদের ক্ষেত্রে- মাসিকের ইতিহাস ও গর্ভধারণের ইতিহাস
- বাচ্চাদের ক্ষেত্রে- টিকা এবং দুধপানের ইতিহাস ব্যক্তিগত ইতিহাস জানলে অনেক রোগ নির্ণয় সহজ হয়। যেমন- ধূমপায়ীদের ফুসফুস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি থাকে।

শারীরিক পরীক্ষা করা

সাধারণ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা (General clinical examination)

সাধারণ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন-

- চেহারা (Appearance)- চেহারা দেখে রোগীর মানসিক অবস্থা, Anxiety, Tension, থ্যালাসেমিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়
- নাড়ী (Pulse)- নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক আছে কি না সেটা দেখতে হবে। নাড়ীর স্পন্দনের অস্বাভাবিকতা সাধারণত হৃদরোগের লক্ষণ
- রক্তচাপ (Blood Pressure)- রক্তচাপ বেড়ে গেলে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়, যেমন- স্ট্রোক (Stroke)। আবার অনেক ক্ষেত্রে রক্তচাপ কমে যায়, যেমন- শক (Shock)
- রক্তস্বল্পতা (Anemia)- রক্তস্বল্পতা অনেক রোগের লক্ষণ, যেমন- কৃমি সংক্রমণ

রক্তস্বল্পতা (Anemia)

জন্ডিস (Jaundice)

- জন্ডিস (Jaundice)- বিভিন্ন রোগে জন্ডিস দেখা যায়, যেমন- Viral Hepatitis, Thalassemia ইত্যাদি
- সায়ানোসিস (Cyanosis)- সায়ানোসিস অনেক রোগের লক্ষণ, যেমন- Birth Asphyxia, COPD ইত্যাদি
- শ্বাস-প্রশ্বাসের হার (Respiratory rate)- বিভিন্ন রোগে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়, যেমন- Pneumonia
- পানিস্বল্পতা (Dehydration)- বিভিন্ন রোগে পানিস্বল্পতা দেখা যায়, যেমন- সাধারণত ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর পানিস্বল্পতা দেখা যায়
- শরীর ফুলে যাওয়া (Edema)- বিভিন্ন রোগে শরীর ফুলে যেতে পারে, যেমন- কিডনি বা যকৃতের রোগ

তন্ত্র অনুযায়ী ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা (Systemic examination)

রোগী যে তন্ত্রের সমস্যা নিয়ে এসেছেন সেই তন্ত্রের সাথে অন্যান্য তন্ত্রও ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

- চোখ দিয়ে দেখতে হবে (Inspection)- কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় কি না
- হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে (Palpation and Percussion)- কোন অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায় কি না
- স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনতে হবে (Auscultation)- কোন অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায় কি না

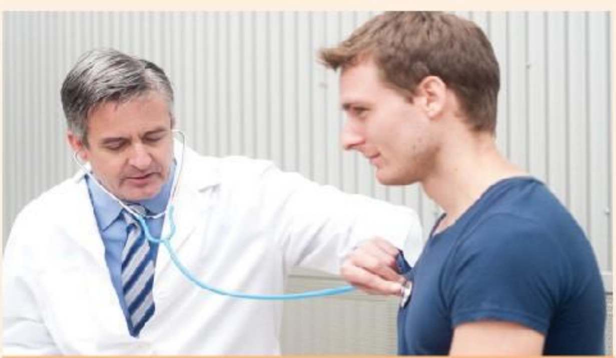

স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে শব্দ শোনা

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

ইতিহাস গ্রহণ ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করার পরও অনেক সময় সঠিক রোগ নির্ণয় ও অবস্থার পরিবর্তন বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করতে হয় ।

রোগ নির্ণয়ের বিশেষ পদ্ধতি (শিশুদের ক্ষেত্রে)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্দেশিত অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (IMCI) পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও রোগ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে শিশুদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন-

- ২ মাসের কম বয়সী
- ২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত

২ মাসের কম বয়সী শিশুর অসুস্থতা নিরূপণ বা রোগ নির্ণয়ের ধাপসমূহ

- মায়ের দুধ খেতে না পারা
- খিঁচুনি হওয়া
- দ্রুত শ্বাস নেয়া (প্রতি মিনিটে ৬০ বা তার অধিক)
- বুকের নিচের অংশ মারাত্মকভাবে দেবে যাওয়া (Severe Chest Indrawing)
- জ্বর বা শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া
- হাতের তালু এবং পায়ের পাতার রং হলুদ হয়ে যাওয়া
- নেতিয়ে পড়া বা অজ্ঞান কিংবা স্বাভাবিকের চেয়ে কম নড়াচড়া করা

২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের অসুস্থতা নিরূপণ বা রোগ নির্ণয়ের ধাপসমূহ

সাধারন বিপদ চিহ্নসমূহ

- খিঁচুনি হওয়া
- নেতিয়ে পড়া বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- পান করতে অথবা মায়ের দুধ খেতে না পারা
- সব কিছু বমি করে ফেলে দেয়া

প্রধান লক্ষণসমূহ

- কাশি বা শ্বাসকষ্ট হওয়া
- ডায়রিয়া হওয়া
- জ্বর হওয়া
- কানের সমস্যা হওয়া

শিশুর দৈহিক পুষ্টি, টিকা, খাদ্যাভ্যাস, ভিটামিন এ ও কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে কি না যাচাই করুন

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস *(Mycobacterium tuberculosis)*

বৈশিষ্ট্য

- মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস এক ধরণের এসিড ফাস্ট ব্যাকটেরিয়া
- এর আকৃতি দন্ডাকার
- এদের বংশবৃদ্ধির জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়
- ইহা ধীরগতিতে বংশবৃদ্ধি করে
- ইহা সাধারণত একক বা ছোট গুচ্ছাকারে থাকে
- ইহা চলাফেরা করতে পারে না
- এদের স্পোর থাকে না
- এদের ক্যাপসুল থাকে না
- এদের এক্সোটক্সিন বা এন্ডোটক্সিন থাকে না

যে সকল রোগ করে

মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস দ্বারা মানবদেহে যে সকল রোগ হয়-

- ফুসফুসের যক্ষ্মা (পালমোনারি টিবি)
- ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা (এক্সট্রা পালমোনারি টিবি)

চিকিৎসা

ফুসফুসের যক্ষ্মা ও ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মার কারণে যে সকল ওষুধ ব্যবহার করা হয়-

প্রথম সারির ওষুধ

- রিফামপিসিন (Rifampicin)
- আইসোনিয়াজাইড (Isoniazid)
- পাইরিজিনামাইড (Pyrizinamide)
- ইথামবিউটল (Ethambutol)
- স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycin)

দ্বিতীয় সারির ওষুধ

- ওফ্লক্সাসিন (Ofloxacin)
- রিফাবিউটিন (Rifabutin)
- ইথিওনামাইড (Ethionamide)
- সাইক্লোসেরিন (Cycloserine)
- প্যারা অ্যামিনো স্যালিসাইলেট (Para aminosalisylate)

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

কুষ্ঠরোগ

কুষ্ঠ একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ যা ত্বক এবং স্নায়ুকোষকে আক্রান্ত করে। কুষ্ঠ রোগ বংশগত কোন রোগ নয়। কুষ্ঠ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আড়াই মাস থেকে কয়েক বছরের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তবে সাধারণত এ রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ৫ বছর পর লক্ষণ দেখা দেয়। কুষ্ঠ রোগের ফলে মৃত্যুর হার যদিও খুবই কম কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে অনেক মানসিক ও সামাজিক সমস্যায় পরতে হয়।

কারণ

মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি *(Mycobacterium leprae)* নামক ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণের কারণে কুষ্ঠরোগ হয়।

সংক্রমণ

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নাক অথবা মুখ দিয়ে সর্দি ঝরলে, হাঁচি-কাশি ও থুথুর মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে। শুধুমাত্র জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলেই সকল ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হয় না। কুষ্ঠরোগ সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী মেলামেশার ফলে হতে পারে। স্পর্শের মাধ্যমে সাধারণত এই রোগ ছড়ায় না। কিন্তু কোন কারণে যদি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং যদি আক্রান্ত বাক্তির সংস্পর্শে আসে তাহলে সে সকল ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে ।

প্রকারভেদ

কুষ্ঠরোগকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়

১) পউসিবাসিলারী লেপ্রসি

- ইন্টারমেডিয়েট লেপ্রসি
- টিউবারকুলয়েড লেপ্রসি
- বর্ডারলাইন টিউবারকিউলয়েড লেপ্রসি

২) মাল্টিবাসিলারী লেপ্রসি

- লেপ্রমাটাস লেপ্রসি
- বর্ডারলাইন লেপ্রমাটাস লেপ্রসি

৩) সিঙ্গেল লেশন পউসিবাসিলারী লেপ্রসি

লক্ষণ

কুষ্ঠরোগের লক্ষণ বুঝতে অনেক সময় লাগে, সাধারণত জীবাণু সংক্রমণের ৫ থেকে ৭ বছর পর উপসর্গসমূহ দেখা যায় এবং উপসর্গ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে রোগের যে সকল লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায়-

- ত্বকে স্পর্শ, ব্যথা ও তাপমাত্রার অনুভূতি হ্রাস পেতে পারে এবং সংক্রমিত স্থান ফুলে যায়

ভিন্ন ধরণের কুষ্ঠরোগে লক্ষণগুলোও ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে-

- টিউবারকুলয়েড (Tuberculoid): ত্বকে লালচে দাগ পড়ে এবং লালচে দাগের পাশাপাশি কিছু কিছু জায়গায় মসৃণ সাদাটে দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানের অনুভূতি হ্রাস পায়
- লেপ্রোমেটাস (Lepromatous): ত্বকের উপরিভাগে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিন্ড অথবা অনেকখানি স্থান জুড়ে লালচে দাগ দেখা যায়। শরীরের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যায়। ত্বকের অনেক অংশ এবং শরীরের নানা অঙ্গ যেমন- কিডনী এবং অন্ডকোষও আক্রান্ত হতে পারে। অনেক সময় ভ্রু ঝড়ে পরে
- বর্ডারলাইন (Borderline): উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে এবং চিকিৎসা না করানো হলে এটি টিউবারকুলয়েড লেপ্রসির মত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে কিন্তু পরে আরো খারাপ হয়ে লেপ্রোমেটাস লেপ্রসির মত বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে

পরীক্ষা

- মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষা- আক্রান্ত স্থান থেকে টিস্যু নিয়ে মডিফাইড জিল-নিলসেন স্টেইনিং (Modified Ziehl-Neelsen staining) এর মাধ্যমে জীবাণুর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়
- লেপ্রমিন টেস্ট- এর মাধ্যমে জীবাণুর উপস্থিতি দেখা হয়
- আক্রান্ত স্থানের চামড়া এবং স্নায়ু থেকে টিস্যু নিয়ে বায়োপসি করে জীবাণুর উপস্থিতি দেখা হয়

চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়। রোগের ধরণ, মাত্রা এবং রোগীর বয়স বিবেচনা করে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে WHO থেকে বর্ণিত চিকিৎসা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

চিকিৎসার প্রথম ধাপ হল রোগীকে রোগটি সম্পর্কে ভালোমতো বুঝিয়ে বলা। এর চিকিৎসা এবং রোগের জটিলতা সম্পর্কে ভালোমতো জানানো। সেইসাথে সামাজিক কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে অভয় দেয়া। একই সাথে মূল চিকিৎসা হিসেবে দীর্ঘ মেয়াদী ঔষধ সেবন। বিভিন্ন ধরণের কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার মেয়াদ এবং ঔষধের পরিমাণ নির্দিষ্ট।

১) পউসিবাসিলারী লেপ্রসি এর জন্য ৬ মাসব্যপী রেজিমেন

- ড্যাপসোন
- রিফামপিসিন

২) মাল্টিবাসিলারী লেপ্রসি এর জন্য ১২ মাসব্যাপী রেজিমেন

- ড্যাপসোন
- রিফামপিসিন
- ক্লোফাজিমিন

৩) সিঙ্গেল লেশন পউসিবাসিলারী লেপ্রসি এর জন্য একটি ডোজ

- ওফ্লক্সাসিন
- রিফামপিসিন
- মিনোসাইক্লিন

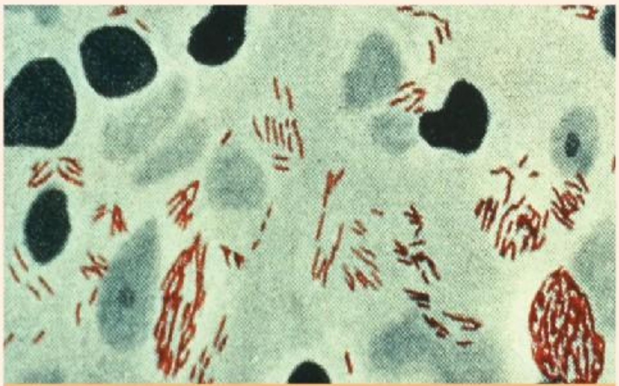

মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি *(Mycobacterium leprae)*

জটিলতা

- পক্ষাঘাতগ্রস্থতা (Paralysis)
- অস্থি এবং অস্থিমজ্জার প্রদাহ (Osteomyelitis)
- চোখের প্রদাহ এবং অন্ধত্ব (Keratitis and Blindness)
- রক্তের সংক্রমণ (Sepsis)
- রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কমে যাওয়া (Immunosuppression)

প্রতিরোধ

বিসিজি টিকা গ্রহনের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে নিঃসৃত তরল এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকে যে ফুসকুড়ি হয়, কোনভাবেই তার সংস্পর্শে আসা যাবে না।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

রক্তচাপ মাপার নিয়ম

রক্ত ধমনীর ভিতর দিয়ে চলাচলের সময় ধমনীর দেয়ালের উপর যেই চাপ বা প্রেসার সৃষ্টি করে তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বলে। একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ ১২০/৮০ মিলিমিটার অফ মারকারি । আর এই রক্তচাপ যদি ১৪০/৯০ মিলিমিটার অফ মারকারি অথবা এর বেশি হয়, তাহলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে। আর এই উচ্চ রক্তচাপের কারণে স্ট্রোক, হৃদরোগ ও কিডনির সমস্যাসহ নানা ধরণের প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে যা সারা বিশ্বে ৫০%-৬০% মৃত্যুর কারণ। সারা বিশ্বে ১৫০ কোটি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে এবং প্রতি বছর ৭০ লক্ষ মানুষ এই রোগে মারা যায়। বাংলাদেশে প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে অনেক মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব। তাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরী। নিয়মিত রক্তচাপ মাপার অভ্যাসকে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন খুবই উৎসাহিত করেছে ।

১ম ধাপ

সঠিক পরিমাপক যন্ত্র বাছাইকরণ

- একটি স্টেথোস্কোপ
- একটি এনেরয়েড স্ফিগমোম্যানোমিটার এবং এর সাথে সংযুক্ত কাফ

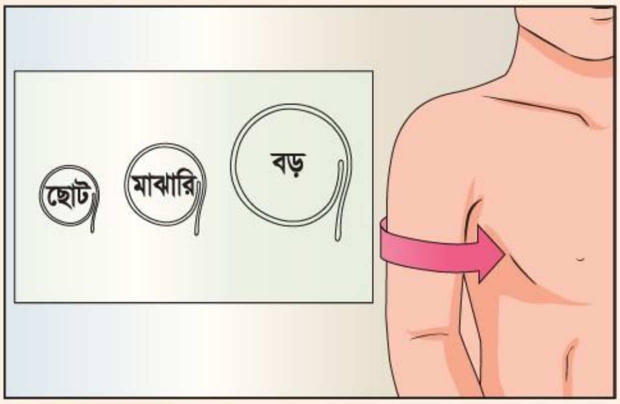

২য় ধাপ

সঠিক সাইজের কাফ নির্বাচন

রক্তচাপ মাপার ক্ষেত্রে কাফ (যেটি হাতে বাধা হয়) এর পরিমাপ খুব গুরুত্বপূর্ন। মোটা মানুষদের জন্য বড় মাপের, সাধারণ মানুষদের জন্য মাঝারি মাপের এবং বাচ্চাদের জন্য ছোট মাপের কাফ হচ্ছে আদর্শ পরিমাপক।

৪র্থ ধাপ

সঠিকভাবে কাফ এবং স্টেথোস্কোপ বসানো

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিকভাবে রক্তচাপ মাপার জন্য সঠিকভাবে কাফ এবং স্টেথোস্কোপ নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে। প্রথমে ব্রাকিয়াল ধমনীর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। কনুইয়ের সামনের ভাঁজের ২.৫ সে.মি. উপরে কাফটি সঠিকভাবে বাহুর চারিদিকে মোড়াতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো কাপড়ের সাথে লেগে না থাকে। স্টেথোস্কোপ দিয়ে সঠিকভাবে শব্দ শোনার জন্য ইয়ার পিসগুলোকে সামনের অবস্থানে রাখতে হবে। একই বাহুতে কাফ স্থাপন করে, দৃঢ় স্পন্দনগুলি সনাক্ত করতে অ্যান্টিকিউবিটাল ফোসার স্থান নির্দেশ করতে হবে। এই অবস্থানে ব্র্যাকিয়াল ধমনীর উপর স্টেথোস্কোপের বেল রাখতে হবে ।

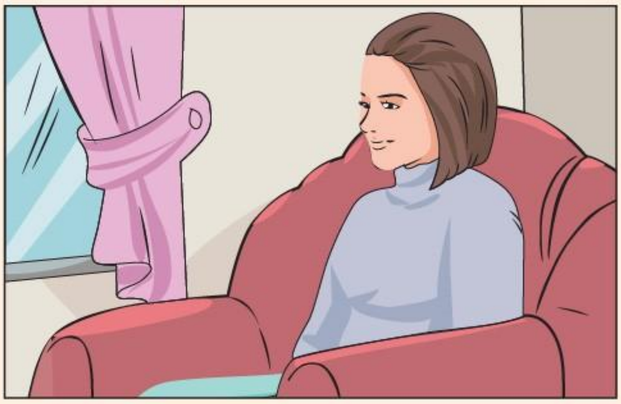

৩য় ধাপ

রক্তচাপ মাপার জন্য রোগীকে প্রস্তুত করা

রক্তচাপ মাপার সময় রোগীকে কমপক্ষে ৫ মিনিট চুপচাপ বসিয়ে রাখতে হবে, রোগীকে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসাতে হবে এবং রক্তচাপ মাপার কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত রোগীকে কোন পান, সিগারেট, জর্দা, গুল, চা, কফি, ইত্যাদি খেতে মানা করতে হবে। রক্তচাপ মাপার সময় কাপড় এমন ভাবে গুটিয়ে হাতের উপর আনতে হবে যাতে হাতের উপর কাপড়ের কোনো চাপ তৈরী না হয়।

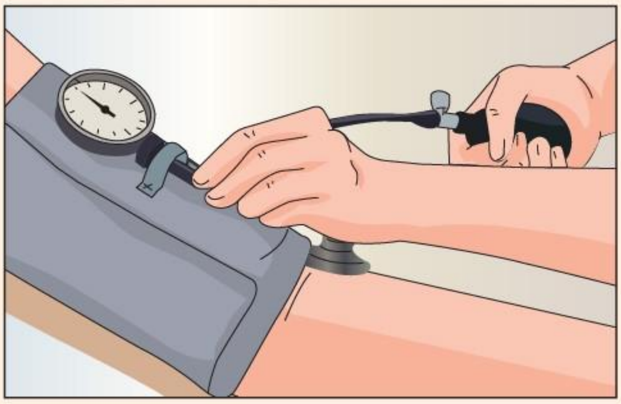

৫ম ধাপ

সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপ পরিমাপ

রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের ঘড়ি হৃদপিন্ডের একই সমান্তরালে অবস্থান করতে হবে। এরপর রেডিয়াল ধমনী অনুভব করে এবং ধীরে ধীরে যন্ত্রের চাপ বাড়াতে হবে। রেডিয়াল পালস্ বন্ধ হওয়ার পর চাপ ৩০ মিঃ মিঃ উপরে নিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে চাপ কমাতে হবে। এবার চাপ কমানোর সময় স্টেথোস্কোপ দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীতে সৃষ্ট শব্দ মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হবে। এই শব্দ হওয়া যখন শুরু হয় তখন তাকে সিস্টোলিক প্রেসার এবং এই চলমান শব্দ যখন শেষ হয় তখন তাকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলে ।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

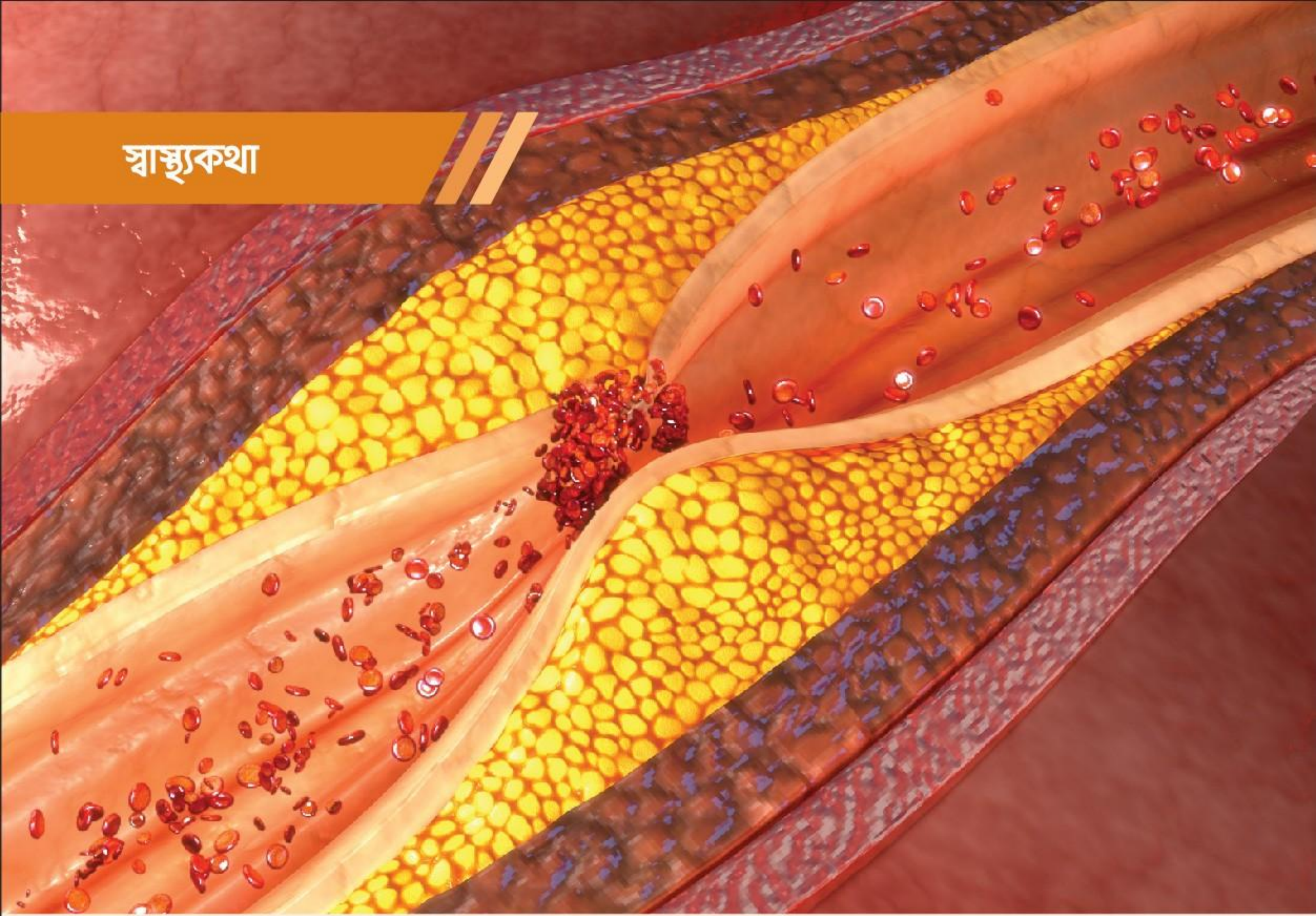

কোলেস্টেরলের ভাল-মন্দ

এলডিএল

রক্তের বেশিরভাগ কোলেস্টেরল যে প্রোটিন বহন করে থাকে একে বলে লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা এলডিএল (LDL)। এতে প্রোটিন কম ও ফ্যাট বেশি থাকে। রক্তে এর পরিমাণ বেড়ে গেলে ধমনীর দেয়ালে ক্ষতিকর পাক তৈরি হয়, যার ফলে অনেক সময় রক্তনালী ব্লক হয়ে রক্ত সঞ্চালনে ব্যঘাত ঘটে, এতে করে হার্ট অ্যাটাক বা ব্রেইন স্ট্রোকের মত সমস্যা হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই এর পরিমাণ বেশি থাকা স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ। রক্তে এলডিএলের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১০০ মিলিগ্রাম পার ডিএল এর নিচে।

এইচডিএল

রক্তের কোলেস্টেরলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বহন করে হাই- ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা এইচডিএল (HDL)। এর বেশির ভাগ উপাদানই হলো প্রোটিন, যার সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণ চর্বি মিশ্রিত থাকে। এইচডিএল ধমনীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় খারাপ কোলেস্টেরলকে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে ও পরবর্তীতে তা শরীর থেকে বের করে দেয়। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। পক্ষান্তরে এর পরিমাণ কমে গেলে হৃদরোগের ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। রক্তে এইচডিএলের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ৪০ মিলিগ্রাম পার ডিএল এর উপরে।

ট্রাইগ্লিসারাইড

ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) হলো এমন একটি কোলেস্টেরল, যাতে খুব অল্প পরিমাণ লাইপোপ্রোটিন থাকে। সাধারণত রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড এর পরিমাণ কম থাকে কিন্তু চর্বিকোষে এরা বেশি মাত্রায় জমা থাকে। যারা খুব বেশি শর্করা জাতীয় খাবার খান, যাদের ওজন বেশি, ধূমপায়ী বা মদ্যপায়ী তাদের ট্রাইগ্লিসারাইড এর পরিমাণ বেশি থাকে। রক্তে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১৫০ মিলিগ্রাম পার ডিএল এর নিচে ।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ 'রোগ নির্ণয় পদ্ধতি' থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডটি আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১) রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রধান অংশ কোনটি?

ক) রোগীর ইতিহাস নেওয়া
খ) ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করা
গ) রোগীর নাম জানা
ঘ) রোগীর আস্থা অর্জন করা

২) রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর কোন তথ্যটি নিতে হবে?

ক) রোগীর নাম
খ) রোগীর বয়স
গ) রোগীর বৈবাহিক অবস্থা
ঘ) উপরের সবগুলো

৩) রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য কোনটি ব্যক্তিগত ইতিহাস না?

ক) ধূমপান
খ) মদ্যপান
গ) মাসিকের ইতিহাস
ঘ) শ্বাসকষ্ট

৪) বাচ্চাদের রোগ নির্ণয়ে নিচের কোন ইতিহাসটি নেয়া হয়?

ক) মদ্যপানের অভ্যাস
খ) মাসিকের ইতিহাস
গ) টিকা এবং দুধ পানের ইতিহাস
ঘ) গর্ভধারণের ইতিহাস

৫) শিশুদের সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে WHO নির্দেশিত কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?

ক) অ্যাপগার স্কোর
খ) আই এম সি আই
গ) এম আর আই
ঘ) ই পি আই

৬) তন্ত্র অনুযায়ী ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় কি করা হয় না?

ক) চোখ দিয়ে দেখা
খ) কান দিয়ে শোনা
গ) হাত দিয়ে পরীক্ষা করা
ঘ) স্টেথোস্কোপ দিয়ে শোনা

৭) রোগীর শারীরিক পরীক্ষার জন্য কোন উপসর্গটি দেখা হয়?

ক) রক্তস্বল্পতা
খ) শ্বাস-প্রশ্বাসের হার
গ) সায়ানোসিস
ঘ) উপরের সবগুলো

৮) গর্ভনিরোধক ওষুধের ইতিহাস কার কাছ থেকে নিতে হবে?

ক) অবিবাহিত মহিলা
খ) বিবাহিত মহিলা
গ) অবিবাহিত পুরুষ
ঘ) বিবাহিত পুরুষ

৯) ২ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের রোগ নির্ণয়ের প্রধান লক্ষণ কোনটি?

ক) কাশি
খ) ডায়রিয়া
গ) জ্বর
ঘ) উপরের সবগুলো

১০) ২ মাসের কম বয়সী শিশুদের রোগ নির্ণয়ের জন্য কোন বিপদ চিহ্নটি দেখা যায় না?

ক) খিঁচুনি
খ) জ্বর
গ) পাইলস
ঘ) দ্রুত শ্বাস

অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সকে ত্বরান্বিত করে যেটা বিশ্বস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম বৃহত্তম হুমকি

অ্যান্টিবায়োটিক এর যৌক্তিক ব্যবহার

অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ব্যাকটেরিয়াকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী করে তোলে।

সকল ইনফেকশনের চিকিৎসাই অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা হয় না; ভাইরাস ঘটিত ইনফেকশনের যেমন সাধারণ ঠান্ডা লাগা এবং ফ্লু চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না।

প্রেসক্রিপশন ব্যতিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা ঠিক না, অ্যান্টিবায়োটিক পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবের সাথে শেয়ার না করাই ভাল।

অ্যান্টিবায়োটিকই সবসময় সব রোগের সমাধান নয়।

সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করে যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।

World Health Organization

এডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৮৯ গুলশান এভিনিউ, সিম্পলট্রি আনারকলি, ঢাকা-১২১২